



মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সমাধান কোথায়

ইবনে বতুতা

=====

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলামী ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের সাথে বিজড়িত এক ভূখণ্ডের নাম ফিলিস্তিন। বহু নবী (আঃ) এর পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত এই ফিলিস্তিন। এই ভূখণ্ডে জন্ম নিয়েছেন ঈসা (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), জাকারিয়া (আঃ) প্রমুখ সহ সহস্রাধিক সম্মানিত নবী। এই ভূখণ্ড ছিল হযরত ইব্রাহিম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ)-এর তাওহীদের বাণী প্রচার ক্ষেত্র। মুসলমানদের প্রথম কেবলা, অন্যতম পবিত্র স্থান ও রাসূল (সাঃ)-এর মিরাজের পবিত্র স্মৃতিবাহী আল-আকসা মসজিদ এই ভূ-খণ্ডেই অবস্থিত। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) - এর স্মৃতিবাহী উমর মসজিদও এই ভূ-খণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষ বর্ষে আবু ওবায়দা (রাঃ) ও খালেদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ইয়ারমুক প্রান্তরে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করলে ফিলিস্তিন মুসলমানদের দখলে আসে। সেই থেকে কয়েক বছর ব্যতীত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ফিলিস্তিন মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিলিস্তিনের জেরুজালেম নগরী একই সাথে মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র ভূমি হওয়ায় এই নগরীর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মুসলিম ও খৃষ্টানদের মধ্যে বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এ ফিলিস্তিনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের তাণ্ডব। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আক্রমণে এ ভূখণ্ড বারংবার রক্ত রঞ্জিত হয়েছে, অশান্তির ঢেউ বয়ে গেছে, তার উপর থেকে। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, মক্কা-মদীনার পর মুসলমানদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং ঐতিহাসিক ভূ-খণ্ড ফিলিস্তিন আজ আর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আল-আকসা মসজিদ আজ বেদখল, ফিলিস্তিন নামক ভূ-খণ্ডটির নাম ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এই ভূ-খণ্ডটি জবর দখল করে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মুসলিম বিশ্বের এক অশুভ মুহূর্তে এর বুকের উপর চাপিয়ে দেয় এক জগদদল পাথর অবৈধ রাষ্ট্র "ঈসরাইল"। সাম্রাজ্যবাদী ও জায়েনবাদীদের আগ্রাসন ফিলিস্তিনকে গ্রাস করেই থেমে থাকেনি, তাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে আরও বিস্তৃর্ণ আরব ভূ-খণ্ড, পবিত্র নগরী জেরুজালেম এবং অলি-আকসা মসজিদ।

পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র এই ইসরাইল। মুসা (আঃ) এর প্রচারিত তাওহীদ ও আসমানী কিতাব তাওরাতকে বিকৃতকারী এবং অভিশপ্ত ইহুদীরা এই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠাতা। ইতিহাস, সকল প্রকার আন্তর্জাতিক আইন ও রীতি-নীতিকে উপেক্ষা করে পেশী শক্তির বলে এবং সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এই রাষ্ট্রটির বুনয়াদ গড়ে তোলা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সকল ঐতিহাসিকগণের মতে, খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহুদী উপজাতিগুলি ভাগ্য উন্নয়নের আশায় আরব উপদ্বীপ থেকে কেনানের পার্বত্য এলাকায় (বর্তমান সিনাই উপত্যকা) বসবাস করতে শুরু করে এবং কালক্রমে তাদের বংশধরেরা ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়াকুব (আঃ)-কে আধুনিক ইহুদী নামে পরিচিত ইসরাইল জাতির জনক বলা হয়। কিন্তু প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই অনুর্বর ও পার্বত্য ফিলিস্তিন ত্যাগ করে ৫০ লক্ষের মধ্যে ৪৩ লক্ষ ইহুদী ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার

বিভিন্ন দেশে চলে যায়। একই সময়ে রোমানরা ফিলিস্তিন দখল করে ইহুদীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে। ফলে ফিলিস্তিনের বাকী ইহুদীরা দেশ ত্যাগ করে অনত্র চলে যায়। ষোল শতকে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা দাড়ায় মাত্র পাঁচ হাজারে। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদীরা পাশ্চাত্যের ঘারে পা রেখে ভাড়াটিয়া হিসেবে জড়ো হয়ে যে ইসরাঈল রাষ্ট্রটি কায়েম করে ফিলিস্তিনের ওপর নিজেদের অধিকার দাবী করেছে তা ঐতিহাসিকভাবেই অযৌক্তিক। এসব ইহুদীরা এবং তাদের পূর্বপুরুষরাও সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা নয়। দূরদেশের বাসিন্দা এসব ইহুদীরা তাদের দাবীকে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে যুক্তিসংগত প্রমাণের উদ্দেশ্যে যে ধর্মীয় কল্পকাহিনী প্রচার করে থাকে তা কোন ভাবেই ধোপে টেকাতে পারছে না।

ইহুদীরা জুডাইক কল্পকাহিনী, জেরুজালেমের ঐতিহাসিক স্মৃতি জিওনের পবিত্র পাহাড়, বহু নবী (আঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত আল আকসা মসজিদ জেরুজালেমে অবস্থিত বলে ইহুদীরা জেরুজালেমকে রাজধানী করে ইহুদী রাষ্ট্র গঠনের অধিকার দাবী করলে দীর্ঘ চৌদ্দ শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনের বাসিন্দা আরব মুসলমানরা তাদের পবিত্র ভূমি জেরুজালেম এবং রাসূল (সাঃ) এর পবিত্র স্মৃতিবাহী মসজিদ যে ভূ-খণ্ডে অবস্থিত সেখানে রাষ্ট্র গঠন দূরে থাক বসবাসেরও অধিকার পাবে না কেন?

ধর্মীয় রূপকথাকে অবলম্বন করে রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী স্বীকার করে নিলে দুনিয়ার সকল মুসলমান যদি একত্রিত হয়ে আরব নাগরিকদের বহিস্কার করে মক্কা মদীনাকে কেন্দ্র করে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে তবে তাদের সে দাবী কি যৌক্তিক হবে? বিশ্বের ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা ভ্যাটিক্যানকে কেন্দ্র করে ইটালিয়ানদের তাড়িয়ে যদি একটি ক্যাথলিক রাষ্ট্র গঠন করতে চায় তবে ইটালীর নাগরিকেরা কি সে দাবী মেনে নিবে?

অথচ আধুনিক সভ্যতার নির্মাণে দাবীদার কামার কুমারেরা এই সভ্য যুগেও নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই যুক্তিহীনতা এবং অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণকারী বর্বরদের প্রশ্রয় ও শক্তি যুগিয়ে যাচ্ছে। অপরাধীদের তাদের অপরাধ চালিয়ে যেতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। ইটালিয়ানদের দেশছাড়া করে যদি ভ্যাটিকান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের খৃষ্টান রাষ্ট্র কায়েম করার সুযোগ করে দেয় তবে ইটালিয়ানদের ক্যাথলিক খৃষ্টানদের বাধা প্রধান করার অধিকার ন্যায় সম্ভব এবং সভ্যতাগী বিশ্ব কর্তৃক স্বীকৃতও। অথচ এই সভ্য যুগের আইন কানুনই ফিলিস্তিনীদের বেলায় প্রয়োগ হচ্ছে বিপরীত ভাবে। ফিলিস্তিনী আরবরা দেশটির শতাব্দীর পর শতাব্দীর স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও এবং জায়নবাদীদের অগ্রাসনকে প্রতিহত করার অধিকার ন্যায় সম্ভব হলেও তা সাদা দুনিয়ার সভ্য মানুষেরা মানতে চান না। তাদের দৃষ্টিতে ফিলিস্তিনীরা সন্ত্রাসবাদী, তারা মানবতার ঘণিত শত্রু।

ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইহুদীদের কখনও কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। আব্রাহামের অভিশপ্ত এ জাতি ছিল সর্বত্র লাঞ্ছনা ও ঘণার শিকার। চক্রান্ত, ধূর্তামী এবং গণ্ডগোল সৃষ্টি করে স্বার্থ উদ্ধার ইহুদীদের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিণত হওয়ায় ইউরোপের প্রতিটি দেশে এরা ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এছাড়া যিশু খৃস্টের [ঈসা (আঃ)] এর হত্যা প্রচেষ্টার সাথে ইহুদীরা জড়িত ছিল বলে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্যের ইহুদীরা খৃষ্টানদের কর্তৃক পথেঘাটে হত্যার শিকার হত। এ সময় পর্যন্ত ইহুদীরা ছিল খৃষ্ট জগতের অন্যতম শত্রু। এই সময়ে খৃষ্টান জগত মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বারংবার ক্রুসেড চালিয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাশ্চাত্যের খৃষ্টজগত মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ে ক্রুসেড পরাজয়ের ষোল আনা প্রতিশোধ নিতে উদ্যোগী হয়। তারা মুসলিম শক্তিকে চিরদিন দমন করে রাখার উদ্দেশ্যে কাটা দিয়ে কাটা, তোলার কুমতলব আটে। এই যুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স আরব বিশ্বে জাতীয়তাবাদের ধূয়া তুলে তুর্কী উসমানীয়দের কর্তৃক ৪০০ বছর যাবৎ শাসিত ইরাক, সিরিয়া দখল করে। ফিলিস্তিন ও লেবানন তখন সিরিয়া প্রদেশের অংশ ছিল। ভাগাভাগির স্বার্থে ফ্রান্স ও বৃটেন ফিলিস্তিনকে সিরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং

বুটেনের দখলে চলে যায়। যুদ্ধ চলাকালে ইহুদী ডাক্তার উইজম্যান বুটেনকে উড়োজাহাজ তৈরির সূত্র দিয়ে সাহায্য করার বিনিময়ে ইহুদীদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের গোপন প্রতিশ্রুতি আদায় করে। জার্মানীর হিটলার বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের পাইকারী হত্যার নির্দেশ দিলে পলাতক ইহুদীরা মিত্র পক্ষের ছত্রছায়ায় নিজ ইউনিট গঠন করে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এসব ইহুদী ইউনিট তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর সাথেও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

এ ছাড়া ধনী ইহুদী ব্যংকার গোষ্ঠি যুদ্ধের সময় মিত্র পক্ষকে দেয়া বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা মওকুফের বিনিময়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের শর্ত আরোপ করলে পাশ্চাত্য তাদের এককালের শত্রুদের মুসলমানদের ঘাড়ের ওপর বসিয়ে ছড়ি ঘোরানোর জন্য ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করার পরিকল্পনা নেয়। এভাবেই ইহুদী-খৃষ্টানদের মধ্যে এক অশুভ আতাতের ফলে সৃষ্টি হয় জারজ রাষ্ট্র ইসরাঈল। ১৯২২ সালে বুটেন সাম্রাজ্যবাদের ধংজাধারী তৎকালীন জাতিসংঘ (লিগ অব ন্যাশনস) কে ব্যবহার করে ফিলিস্তিনে ম্যানডেটরী শাসন কায়েম করে। এই সময়ে ফিলিস্তিনে আরব মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, অন্যদিকে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৩ হাজার। লিগ অব ন্যাশনসের ম্যানডেটরী শাসনের হুকুমনামার অপব্যবহার করে বুটেন ক্রমাগত ইহুদীদের আমদানী করে ফিলিস্তিনে জমা করতে থাকে এবং ১৯৪৭ সাল নাগাদ ইহুদীদের সংখ্যা দাড়ায় ১০ লক্ষে। ইহুদী ধনকুবের খচাইন্ড হার্শ ও অন্যান্যদের অর্থ ব্যবহার করে ইহুদীরা এ সময় অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় ও নিজস্ব সন্ত্রাসবাদী দল গঠন করে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের ওপর ব্যাপক জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ ও খেদাও অভিযান চালিয়ে ভূমি দখল করতে থাকে। ১৯৪৭- ৪৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী নিহত হয়। অবশেষে লিগ অব নেশনস ঘোষিত বুটেনের ম্যানডেটরী শাসনের অবসান ঘটলে বুটেনের প্রত্যক্ষ মদদে ইহুদীরা ১৯৪৮ সালে ইসরাঈল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়।

জন্মলগ্ন থেকেই ইসরাঈল রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি মালা লংঘন, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। প্রতিবেশী আরবদের ওপর চাপিয়ে দেয় বেশ কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ প্রতিবারই পরাশক্তি রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র, সৈন্য ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে ইসরাঈলকে আরবদের রোষানল থেকে রক্ষা করে। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে রাশিয়া, মিশরের সাথে বেঈমানী করে এবং আমেরিকার বিপুল পরিমাণ সৈন্য - ইহুদীদের পক্ষে লড়াই করায় পর্যুদন্ত ইহুদীরা কোন মতে রক্ষা পায়। সেবারই তারা আল-আকসা মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়, মসজিদ অবমাননা করে এবং আরবদের ৬৭ হাজার বর্গ মাইল এলাকা দখল করে নেয়।

ইসরাইলী-ইহুদী আগ্রাসন এখনও অব্যাহত আছে। ইসরাঈলকে টিকে থাকার জন্য মদদ যোগাচ্ছে বুটেন, ফ্রান্স এবং বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্র। পাশ্চাত্য তাদের এককালের শত্রুদের ব্যবহার করে ইসলামী আন্দোলনের সূতিকাগার মধ্যপ্রাচ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে ইসলামের পূর্ণজাগরণ ঠেকাতে চাচ্ছে। তাদের প্রধান শত্রু মুসলমানদের দমন করাচ্ছে। আরব বিশ্বের হাজারো সমস্যার পেছনে রয়েছে ইসরাঈল। বলা যায় এই ইসরাঈলই হল মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমস্যা। পাশ্চাত্য তেলের সরবরাহ নিরাপদ রাখা এবং মুসলমানদের দমন করার জন্য একদিকে ইসরাঈলের সমরাস্ত্র ভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে, অন্যদিকে ইসরাইলের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে আরবদের শান্তি স্থাপনের উপদেশ দিচ্ছে। ইসরাঈলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মধ্যপ্রাচ্যে কোন মুসলিম দেশের সামরিক শক্তি যাতে বৃদ্ধি না পায় সে জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা তৎপর। এইত সেদিন ইরাকের সামরিক শক্তি ধ্বংস করে দেয়া হল, অতীতে মিশরকেও বেশ কয়েকবার হস্ত নেষ্ট করা হয়েছে একমাত্র এই কারণে। এছাড়া আরবরা কখনো ঐক্যবদ্ধ না হতে পারে সেজন্য আরব উপদ্বীপকে টুকরো টুকরো করে কয়েক ডজন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এবং ভূ-সীমানা ও জাতীয়তা প্রভৃতি কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করে একটি

দেশকে অন্য দেশের শত্রুতে পরিণত করে রাখা হয়েছে। ইরাক-কুয়েত, ইরাক-ইরান, কুদী, ইয়ামেন-সৌদী আরব, ইরান-আরব আমিরাত, সুদান- মিশর প্রভৃতি দেশের মধ্যে যে ভু-খণ্ডগত বিরোধ ও যুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনেও রয়েছে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কালো হাত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই সব শক্তি দীর্ঘ ৪০০ বছর যাবৎ রাজনীতির অভিজ্ঞতাহীন বিভিন্ন এলাকার আরবদের জাতীয়তাবাদ, সেকুলারিজম, কমুনিজম, গণতন্ত্রের বুলি শিখিয়ে বিভ্রান্ত করে এবং বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সরকার কায়েম হওয়ায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা রাজনৈতিক ঠাণ্ডা লড়াই চলতে থাকে। ইরাক-সিরিয়া, ইরাক-মিশর, লিবিয়া-সৌদি আরব প্রভৃতি দেশের পারস্পরিক বৈরিতা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়াও কোন দেশের রাষ্ট্র প্রধান ইসলামের পক্ষে বা ইসরাইলের বিপক্ষে কোন পদক্ষেপ নিলে তাকে গুপ্ত হত্যার শিকার হতে হয়েছে অথবা ক্ষমতালোভী সামরিক অফিসারদেরকে লেলিয়ে দিয়ে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে। অতএব একবাক্যে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদী চক্র মধ্য প্রাচ্যের তেল লুণ্ঠন করে নেয়া এবং ইসলামের পূর্ণজাগরণ ঠেকানোর জন্য ইসরাইলের অংকুরিত হওয়া থেকে তার গোড়ায় পানি ঢেলে একটা প্রকাণ্ড মাহিরুহে পরিণত করেছে। ইসরাইলের চৌকিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলিম দেশগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টি করে মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে।

অতীব দুঃখজনক হলেও সত্য মধ্যপ্রাচ্যের কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রপ্রভু মুসলমানদের এসব জাতীয় স্বার্থের শত্রুদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে মধ্য প্রাচ্যের সমস্যাকে আরো জটিলতর করে তুলেছে। এই আরবের বুকেই বিশ্ব কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক শরীফ হুসাইনের জন্ম এবং তাদের সামনে তার বিশ্বাসঘাতকতার মর্মান্তিক পরিণতির জ্বলন্ত ইতিহাস থাকতেও তারা সে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না। এরা ইহুদী এবং ইহুদী নিয়ন্ত্রিত শক্তিগুলোর নির্লজ্জ দালালী করে মুসলিম স্বার্থের বুকে অহরহ ছুরি চালিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সমাধানে এসব গদিবাদী রাষ্ট্রপ্রভুরাও একটা মস্তবড় অন্তরায়।

ইতিহাস সাক্ষী, অতীতে ফিলিস্তিন উদ্ধারের জন্য অরবরা বিভিন্ন প্রকারের সশস্ত্র সংগ্রাম ও রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়েছে। কিন্তু পরাশক্তির ওপর নিভরশীলতা, আন্তর্জাতিক অবৈধ চাপের নিকট নতি স্বীকার এবং সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ফিলিস্তিন আজও আরবদের নাগালের বাহিরে। আমরা দেখেছি, ফিলিস্তিনী আরব মুসলমানদের মাতৃভূমি উদ্ধারের সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী প্রধান সংগঠনটি পরাশক্তির করুণা লাভের আশায় ইসলামের আদর্শের চেয়ে সেকুলারিজম ও কম্যুনিজমকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বর্তমানে এটি পাশ্চাত্যের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত ভূ-খণ্ডের ওপর জেকে বসা ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে ক্ষুদ্র গাফা ভূ-খণ্ডের স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার নিয়ে ইহুদীদের সাথে শান্তি স্থাপন করতে প্যারিস, রোম, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ছুটছে।

মধ্য প্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করতে হলে অরবদের চিন্তা-চেতনায়ও ব্যাপক পরিবর্তন অপরিহার্য। দীর্ঘ দিনের পাশ্চাত্যের ইসরাইল সম্পর্কিত ভূমি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, পাশ্চাত্য ইসরাইলের স্বার্থের কোন ব্যাঘাত ঘটুক বা তার অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয় এমন কোন শর্তে শান্তি স্থাপন করতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। সুতরাং তাদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় হবে আরবদের পক্ষে বড় পরাজয়, তাহলে হাজার হাজার শহীদ ফিলিস্তিনীর রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। যে বিষ ফোঁড়ার সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে এত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, আরব জাতির দেহে পচন ধরেছে সেই বিষ ফোঁড়াকে সমূলে ধ্বংস ত্যই মধ্য প্রাচ্য সমস্যার একমাত্র সমাধান। এ লক্ষ্য অর্জনের অন্য অরবদের অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে

পাশ্চাত্যের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে বীর কেশরী সালাউদ্দিন আইউবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।
ইসলামকে রক্ষা নয় ইসলামকে আকড়ে ধরেই নির্ভিক চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্য পানে।
